এক বিচিত্র নদ

কুন্তলা লাহিড়ি

দামোদর এক আশ্চর্য নদ। নামেই প্রকাশ, এ নদীর মত কমনীয় ও লালিত্যময় নয়, বরং দুর্দান্ত পৌরুষে ভরপুর। অবিশ্রান্ত বর্ষণে ফুলে-ফেঁপে ওঠা দামোদরের কিন্তু আরও একটা রূপ আমরা দেখি শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে, যখন তা পরিণত হয় ক্ষীণকায় এক ম্রিয়মাণ জলধারায়। ঘন বর্ষার রাতে যার উদ্দাম জলরাশি পার হবার সাহস রাখে মাত্র দুয়েকটি মানুষ, গ্রীষ্মে তারই হাঁটুজল ভেঙে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায় মানুষ—পশু নির্বিশেষে। ভয়ংকর ও শান্ত এই দুই পরস্পর-বিরোধী ছবি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে কেবল দামোদরই।

দামোদর জাগিয়ে তোলে মনের মধ্যে নানা পরস্পরবিরোধী আবেগ। 'ধ্বংসের নদ', 'দুঃখের নদ'—এই পরিচয়ে তাকে জেনে ভয় পাই, মনে দেখা দেয় নানা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। আবার সেই দামোদরই গ্রামে গ্রামে আনন্দের সাড়া তোলে যখন মঙ্গলের স্মারক হিসেবে বয়ে আসে দামোদরের খালের জল। শহরে শহরে জ্বলে ওঠে দামোদরের কল্যাণে পাওয়া বিদ্যুতের আলো, যেন তাকে দীপাবলীর অর্ঘ সাজিয়ে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যেই। একদিকে ধ্বংস ও সংহার, অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালন—দামোদরের এই দ্বৈত ভূমিকা আমাদের নাড়া দেয়, আপ্লুত করে আবেগে।

এ এক এমন নদ যাকে ঠিক একটা বিশেষণে ভূষিত করা চলে না, যার জন্যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। দামোদর যেন বৈচিত্রের প্রতীক। এ নাম অবহেলাভরে শুনে অগ্রাহ্য করা যায় না, সজাগ হয়ে নড়েচড়ে বসতেই হয়। শুধু ভারত নয়, সত্যি কথা বলতে কি, গোটা পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক নদ-নদীর ক্ষেত্রে এই কথা বলা চলে। অন্যান্য যেসব নদী এরকম আবেগ জাগায় মানুষের মনে, তারা প্রত্যেকেই আয়তনে অনেক বড়, নিজের নিজের দেশের প্রধান নদী তারা। আমাদের দামোদর তো সেই তুলনায় নেহাতই বামন।

দামোদরের এও আরেক আশ্চর্য দিক। দৈর্ঘ্যে নিতান্তই ছোট এই নদী, উৎস থেকে মোহানা পর্যন্ত মাত্র পাঁচশ চল্লিশ কিলোমিটার। নদীমাতৃক ভারতের বিপুলায়তন গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মহানদী গোদাবরীদের কাছাকাছি আসে না দামোদর। ছোটনাগপুরের মালভূমির ১০৬৭ মিটার উঁচু খামারপত ও বীরজংগা পাহাড়ের বৃষ্টির জল সৃষ্টি করেছে একটি শীর্ণকায় ঝরণার। এই ঝরণার স্থানীয় নাম 'সোনাসাথী'। এরকম আরও অসংখ্য নদী ও ঝরণা ক্রমশ একসঙ্গে মিলিত হতে হতে সৃষ্টি করেছে যে নদীর তার স্থানীয় নাম 'দেওনদ্'। হিন্দুদের যেমন গঙ্গা, খ্রিস্টানদের জর্ডান—ছোটনাগপুরের আদিবাসী উপজাতিদের চোখে এই নদীটিও তেমনি পবিত্র। হাজারিবাগ জেলায় পৌঁছে এর নাম হয়েছে দামোদর। নামটি কীভাবে এসেছে তাই নিয়েও নানারকম মত আছে। কেউ কেউ বলেন 'দাম' ও 'উদর' এই দুটি শব্দের সন্ধি করে নাম হয়েছে 'দামোদর'। গ্রীষ্মকালে নদীখাতে যখন জল প্রায় থাকে না, তখন গজিয়ে ওঠে অজস্র দাম বা জলজ

গ্রীষ্মের দামোদর অনায়াসে পার হয়ে যায় গরুর পাল

আগাছা।আবার তিরকি সাঁওতালদের চলিত ভাষায় 'দহ' ও 'মোদর'—অর্থাৎ 'জল' ও 'পাত্র'—এই দুটি শব্দ থেকে। এই অর্থে দামোদর হল 'জলপাত্র'। আবার অন্যান্য সাঁওতাল গোষ্ঠীর ভাষায় দামোদর হল 'জলের আবাস'।

দামোদরের অববাহিকা :

দামোদরের মোট অববাহিকার আয়তন ২৪, ২৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এর দুই তৃতীয়াংশই পড়ে বিহারে, ছোটনাগপুর মালভূমিতে। নিম্নগতিতে পড়ে কেবলমাত্র এক তৃতীয়াংশ—বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলায়। দামোদরের গুরুত্বের অনেকখানিই উদ্ভূত হয়েছে এই অববাহিকা অঞ্চলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের থেকে। উচ্চ অংশে দামোদর বইছে কঠিন সুপ্রাচীন শিলার ওপর দিয়ে, অসংখ্য পাহাড় ও টিলার মধ্যে দিয়ে। ফলে উৎসের কাছাকাছি দামোদরের খাত খুবই অসমান ও উঁচুনিচু, কোথাও কোথাও ছোটোখাটো জলপ্রপাত সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে। পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে এই অংশে দামোদর ও তার উপনদীদের ঢাল বেশি, দুই পাড়ও নদীবক্ষ থেকে খাড়া উঠে গেছে। এখানে দামোদর উপত্যকা বেশ উঁচু, প্রায় ১৫৫ মিটার। উৎস থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে দামোদর নেমে এসেছে ৬৩০ মিটারে। প্রায় ছ' কিলোমিটার চলার পর এর উচ্চতা মাত্র ৫০০ মিটার, আর শ' দেড়েক কিলোমিটার পর উচ্চতা আরও কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২২৫ মিটারে।

উচ্চগতিতে দামোদরে এসে মিশেছে অজস্র ছোটোবড় নদী—হাহারো, জামুনিয়া, কাট্‌রি, খুদিয়া, উশ্রি, বেল পাহাড়ি প্রভৃতি। এদের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এরা সকলেই পাহাড়ি, বর্ষার জলে পুষ্ট। ফলে বর্ষাকালে ছাড়া এদের খাতে জল প্রায় থাকেই না, শুকনো বালির ওপর দিয়ে হয়তো কোথাও কোথাও সামান্য জল এঁকেবেঁকে বয়ে চলে। কোনো কোনো নদী বইছে শক্ত ক্ষয় প্রতিরোধক শিলার ওপর দিয়ে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলপ্রপাত ও খরস্রোত। এরকম এক সৌন্দর্যময় জায়গা হল রাজারাপ্পা, এর কাছেই আছে ছিন্নমস্তার মন্দির ও রামগড়। এখান থেকে কিছুদূর উত্তরমুখে বয়ে চলার পর বেরমোর কাছে দামোদরে মিশেছে বোকারো ও কোনার নদী। আরও বেশ কিছুটা চলার পর দিশেরগড়ের কাছে মিশেছে দামোদরের প্রধান উপনদী—বরাকর। এরপরেই দামোদর ঢুকে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গে, আর বইতে শুরু করেছে পূর্বমুখে। এই অংশেই বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সীমা নির্দেশ করছে দামোদর।

নিম্নগতিতে দামোদর বইছে পুরু পলিগঠিত প্রায় সমতল, ঢালবিহীন ভূমির ওপরে। এখানে পৌঁছে নদীরও ঢাল গেছে কমে। ফলে পাহাড় থেকে বয়ে আনা বালি ও পলিকে টানতে না পেরে নদী তাকে সঞ্চিত করছে খাতের উপরে, সৃষ্টি করছে চরের। এসব বালিচরের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে বেণীর মতো বইছে দামোদর। বর্ষার প্রবল বন্যার সময়ে মাঝে মাঝেই নিজের খাত ছেড়ে দামোদর ছুটে যায় পাশের কৃষিখেতের ভেতরে। তৈরি করে নতুন নতুন চলার পথ, স্থানীয়ভাবে যার নাম 'হানা'। আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল পেরিয়ে এসে দামোদর পৌঁছিয়েছে বর্ধমান শহরের দক্ষিণসীমায়। এর কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে চাঁচাই গ্রামের কাছে দামোদর হঠাৎ সমকোণে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে চলতে শুরু করেছে। এটাই দামোদরের তথাকথিত বদ্বীপের শীর্ষবিন্দু। এখানে রয়েছে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বয়ে চলা বেশ কয়েকটি নদী, যেগুলি অতীতে ছিল দামোদরেরই প্রাচীন খাত। কিন্তু আজ এদের সঙ্গে দামোদরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন। অনেকক্ষেত্রে নদীগুলোর উৎসমুখ অবস্থান করছে দামোদরের বর্তমান খাত থেকে কিছুটা দূরে, কোনো জলায়। সর্পিল গতিতে বাঁক সৃষ্টি করে, পুরু পলিস্তরে

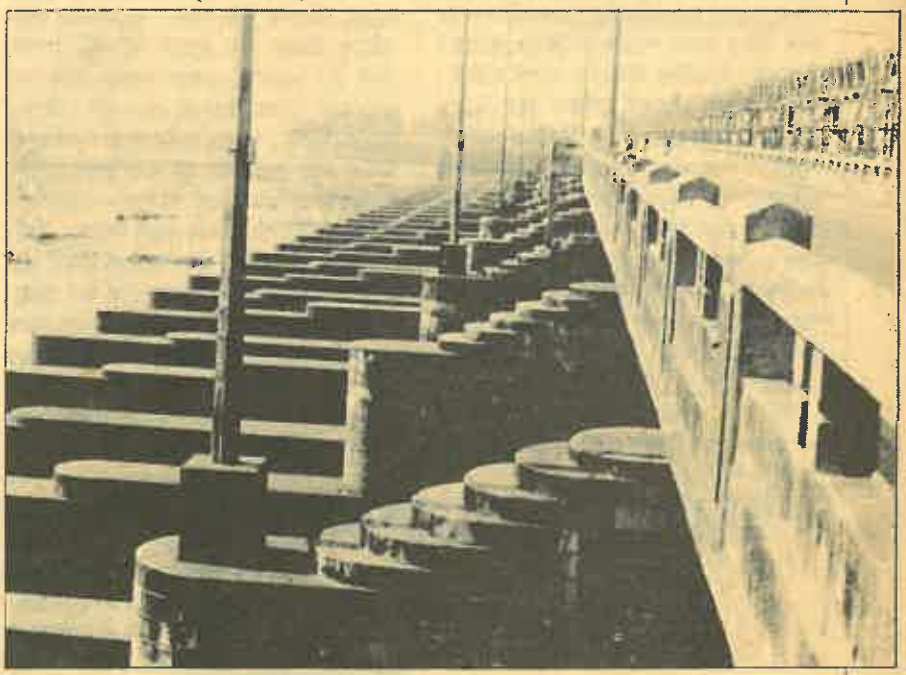

দুর্গাপুর ব্যারেজ : উদ্দাম দামোদরকে বাঁধা হয়েছে বাঁধ দিয়ে

সংকীর্ণ ও গভীর খাত কেটে বয়ে শেষ অবধি তারা এসে মিশেছে হুগলি নদীতে। উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘড়ির কাঁটার অনুসারে নদীগুলির নাম খড়ি, বাঁকা, বেহুলা, গাঙ্গুর, ধুসড়ি আর নয়াসেরাই শাখা। ভ্যান ডেন ব্রুকের আঁকা ১৬৬০ সালের ম্যাপে বাঁকাকে দেখা যায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি নদী হিসাবে। তখন মূল দামোদরের বেশ কিছুটা জল বইত বাঁকার খাত দিয়ে। এমনকি ১৭৮০ সালে প্রকাশিত পেরোঁ-র ম্যাপেও বাঁকাকে বছরের অধিকাংশ সময়েই নাব্য বলে দেখানো হয়েছে। হয়তো বর্ধমান শহরের সমৃদ্ধির পেছনেও এই নদীর অবদান অনেকখানি। আজকের বাঁকা জলের অভাবে মৃতপ্রায় এক বুজে আসা নদী, যার উৎসের সঙ্গে আর বিন্দুমাত্র যোগ নেই। সম্ভবত গত শতাব্দীতে রেলপথ ও সড়কপথের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর সময়ে এদের স্বাভাবিক জলনিকাশ ব্যাহত হয়েছে। দামোদরের বন্যার উদ্বৃত্ত জল এসে এদের খাত পরিষ্কার করতো, কিন্তু এসব রেল ও রাজপথের উঁচু-উঁচু বাধা তাতে প্রতিবন্ধক হয়েছে।

আরও দক্ষিণের নিম্নগতিতে রয়েছে দক্ষিণ বা দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত অসংখ্য 'কানা' ও 'মজা' নদী—এগুলো দামোদরের শাখা নদী বা ডিস্ট্রিবিউটারি। এদের মধ্যে বেগুয়ার হানা দিয়ে মুণ্ডেশ্বরীর পথেই দামোদরের তিন-চতুর্থাংশ জল পৌঁছায় রূপনারায়ণে। এসব শাখানদীগুলোর আচার ব্যবহার উত্তরের খড়ি বা বাঁকা নদীর থেকে অন্যরকম। দামোদরের এই অসংখ্য পরিত্যক্ত খাত ও শাখানদীর মধ্যে মূল খাতটিকে খুঁজে বার করা মুশকিল। যে শাখাটি ফলতার কাছে হুগলিতে এসে পড়েছে তার মাধ্যমে বর্তমানে খুব কমই জলনিকাশ হয়। এই সব শাখানদীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঘিয়া, কানা নদী, কুন্তী, কানা দামোদর, রাণা বাঁধ খাল, কানা খাল (শেষের দুটি মিলে তৈরি করেছে মাদারিয়া খাল), কেদো খাল প্রভৃতি। এই নদীগুলোর নাম ও উৎপত্তি নিয়েও আলোচনার শেষ নেই। কারুর কারুর মতে এগুলি আসলে সেচের সুবিধার জন্য মূল দামোদরের গতিপথ বদলিয়ে কাটা খাল। তাঁরা বলেন, 'কানা' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'canal' থেকে। তবে ভৌগোলিকেরা মনে করেন এসব নদী দামোদরের ছেড়ে আসা পুরনো খাত ছাড়া আর কিছুই নয়। হানা-পথে দামোদর এমনি অজস্রবার খাত বদলেছে—আর ফেলে গেছে অসংখ্য মজা ও কানা নদী। এখানে 'কানা' শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রচলিত অর্থে কানা হল যার একটি চোখ নেই। কানা গলির যেমন একপ্রান্ত বন্ধ, কানা নদীরও তেমন এক দিকের খাত বুজে গেছে। পুরনো ম্যাপ ও বিবরণ থেকে জানা যায় এককালে এসব খাত ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ, সক্রিয় নদী। অতিরিক্ত পলিসঞ্চয়ের ফলে এদের খাতগুলো আর জল ধরে রাখতে পারে না। বছরের পর বছর ধরে পলি ও বালি জমে জমে এদের খাতগুলো হয়ে উঠেছে ভরাট, আর নদীর খেয়ালি গতি পরিবর্তনের ফলে তাতে

যথেষ্ট পরিমাণে জলেরও অভাব ঘটেছে। ফলে নদীগুলো মৃতপ্রায়, কোনো মতে ধুঁকছে। আবার একথাও সত্যি যে এদের মধ্যে দু'একটি নদীর খাতে সারা বছরই কিছু না কিছু জল থাকে। যেমন, কুন্তী নদী ইডেন খাল থেকে পাওয়া জলে প্রতিবছরই ধুয়ে যায়।

নিম্নগতিতে পৌঁছে দামোদর পরিণত হয়েছে এক চওড়া, ধীরবহ, বদ্বীপীয় নদীতে। জায়গায় জায়গায় বন্যার আক্রমণ ঠেকাতে নদীর দু তীরে গড়ে তোলা হয়েছে কৃত্রিম পাড়। এই সব পাড়গুলো বন্যার জলকে দুই পাশের সমৃদ্ধিশালী গ্রামাঞ্চল ও চাষের ক্ষেতে ঢুকতে বাধা দিয়ে যেমন একদিকে উপকার করেছে, অন্যদিকে পলিযুক্ত জলকে খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পলিসঞ্চয়ের কারণ ঘটিয়ে তেমন পরোক্ষ অপকারও করেছে। ফলে নদীর স্বাভাবিক জীবনচক্র ব্যাহত হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় নদীবক্ষ হয়ে উঠেছে আশপাশের জমি থেকেও উঁচু। আবার চড়াপড়া নদীখাতের মধ্যে মধ্যে রয়েছে অল্প একটু গভীর জলে ভরা 'দহ'। নিম্ন দামোদরের খাতে এরকম দহ অজস্র দেখা যায়। এগুলোর আবার স্থানীয় নামও রয়েছে, যেমন বিশালাক্ষীদহ। সাধারণভাবে হুগলি জেলার আমতা পর্যন্ত দামোদর ও তার নানা শাখায় জোয়ার ভাঁটার প্রাধান্য খুবই বেশি।

দামোদর বদ্বীপ

এর আগে বলেছি যে দামোদর সৃষ্টি করেছে এক 'তথাকথিত' বদ্বীপ। এখন দেখা যাক প্রকৃত ভৌগোলিক অর্থে দামোদর সত্যিই বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে কি না।

ভৌগোলিকেরা সাধারণত 'বদ্বীপ' আখ্যা দেন নদীসঞ্চিত পলি দিয়ে গঠিত এমন এক তিনকোণা ভূমিখণ্ডকে যার এক প্রান্তে রয়েছে সমুদ্র বা হ্রদ, অন্যান্য প্রান্তে শাখা নদী। মূল নদীটি যেখান থেকে ভাগ হতে শুরু করে, তা হল বদ্বীপের শীর্ষবিন্দু বা অ্যাপেকস। এই সংজ্ঞা অনুসারে গঙ্গা বা নীল নদের বদ্বীপের থেকে কিছুটা পৃথক দামোদরের বদ্বীপ। প্রথমত দামোদর সোজাসুজি সমুদ্রে এসে পড়েনি, পড়েছে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে রূপনারায়ণ বা হুগলি নদীতে। এই নদীগুলোতে জোয়ার-ভাঁটা খেললেও মূলত তার জন্যেই বদ্বীপের সৃষ্টি হয়নি। দামোদরের বদ্বীপ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেকটা আগেই, এমন এক জায়গায় যেখানে পাহাড় থেকে ক্ষয় করে আনা বোঝা বইতে না পেরে নদী সেই ভার নামিয়ে দিচ্ছে। খাতের গভীরতা ও জলধারণের ক্ষমতা কমে গেলে নদী দুই পাড় ভেঙে অসংখ্য শাখায় সমভূমিতে নেমে আসছে। এরই ফলে নদী এক বদ্বীপের আকার ধারণ করছে। অর্থাৎ খাড়াপাড় শেষ হওয়া, এবং সমতলে নামার সঙ্গে সঙ্গে দামোদরের বদ্বীপ গঠনের কাজ শুরু হচ্ছে। হুগলি নদী যেন এখানে সমুদ্র মুখ হিসাবে কাজ করছে। এসব কারণে দামোদরের বদ্বীপকে এক 'অভ্যন্তরীণ বদ্বীপ (ইনল্যাণ্ড ডেল্টা) বলা যায়। বর্ধমানের শীর্ষবিন্দু থেকে উত্তরে কালনা এবং দক্ষিণে গেঁওখালি পর্যন্ত এই বদ্বীপ বিস্তৃত। সপ্তদশ শতাব্দীতেও দামোদরের প্রধান গতিপথ ছিল কালনার পাশের শাখা দিয়ে, অথচ বর্তমানে দামোদরের মূল শাখাটি এসে পড়েছে দক্ষিণে, রূপনারায়ণে।

গত দু'এক শতাব্দী যাবৎ মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে দামোদরের বদ্বীপ সৃষ্টির স্বাভাবিক কাজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এর দুই ধারের কৃত্রিম পাড়গুলো নদীর বাড়তি জলকে উপছে পড়তে দেয় না—ফলে বাঁকা, খড়ি, কানা প্রভৃতি শাখা নদী তাদের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দামোদরের অধিকাংশ জল প্রবাহিত হচ্ছে মুণ্ডেশ্বরীর মধ্যে দিয়ে—খাতে এসে পড়ছে দামোদরের দক্ষিনাংশের জলও। এর ওপর ডি ভি সির বাঁধগুলো জলের পরিমাণই কমিয়ে দিচ্ছে ফলে ভবিষ্যতেও দামোদর বেওয়া হানার নীচে স্থায়ী খাত সৃষ্টি করবে, যদি না জোয়ারের তাড়নায় শাখাটি আলাদা আলাদা খাতে ভাগ হয়ে যায়।

দামোদরের বন্যা

দামোদর কুখ্যাতি লাভ করেছে তার বিধ্বংসী বন্যার জন্যে। হতে পারে যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, জনপদপূর্ণ ও ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চল বলে, এবং কিছুটা কোলকাতার নৈকট্যের কারণেও, এই বন্যার তীব্রতা যেন বহুগুণে বর্ধিত হয়ে লোকের চোখে ধরা পড়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এই মতও প্রকাশ করেছেন যে সব ব্যাপারটাই খবর কাগজের বাড়ানো, অর্থাৎ 'মিডিয়া হাইপ'। কিন্তু এ বোধহয় একান্তই একপেশে মতামত

আপনার আঙুলে যদি ব্রাশ-দাড়া থাকতো...

তাহলে আপনি দাঁতের পেছনটাও পরিষ্কার করতে পারতেন। দাঁতের পেছনেই তো ক্ষয় শুরু হয়। বেশীর ভাগ টুথব্রাশ আঙুলের মত দাঁতের পেছনে পৌঁছে পরিষ্কার করতে পারে না। কিন্তু এখন এসে গেল প্রমিস ১৫, যার সামনের দিকটা বিশেষভাবে ১৫° বাঁকা করা। তাই, এটি দিয়ে দাঁতের পেছনটাও পরিষ্কার করা একদম সহজ হ'য়ে গেল। এইজন্যেই তো, দাঁতের ডাক্তাররা প্রমিস ১৫ কে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক টুথব্রাশ হিসাবে মানেন।

"সত্যি! এমন চমৎকার উপায় আগে কেউ ভাবেনি কেন?"

নতুন

প্রমিস ১৫

এমন এক টুথব্রাশ, যা আপনার দাঁতের পেছন দিকটাও পরিষ্কার করতে পারে।

কারণ তাহলে আমাদের আলোচনা করতে হয় ভূগোলের কতকগুলো মূল প্রশ্ন নিয়ে—বন্যা কি, তাকে আদৌ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলবো কি না—ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে কি, এসব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর আজও কেউ দিতে পারেন নি। তাই এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। তবে মানতেই হবে যে ১৮২৩, '৪৮, '৫৬, '৫৯, '৬৩, '৮২, '৯০, '৯৮ এবং ১৯০১, '০৫, '০৭, '১৩, '১৬, '২৩, '৩৫ ও '৪৩ সালের বন্যাগুলোতে দামোদর মারাত্মক রকমের ক্ষতিসাধন করেছিল। আমাদের মূল প্রশ্ন হচ্ছে কেবল দামোদরেই এত বন্যা হয় কেন?

এর উত্তর পাওয়া যাবে দামোদর অববাহিকার কতকগুলো ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়ালে এই অববাহিকা দু'টি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত—উচ্চ ও নিম্ন। উচ্চ অববাহিকার আয়তন অনেক বড়, মোটের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। উচ্চ অববাহিকার ভূপ্রকৃতিও অসমতল, যেখানে পাহাড়ী নদীগুলো মালভূমির খাড়া ঢালে প্রবল স্রোতের বেগে নেমে আসছে। অপরপক্ষে দামোদরের নিম্ন অংশ আয়তনে ছোটো, এই সমতলভূমিতে নদীগুলোর ঢাল কম, ফলে স্রোতোবেগও কম। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত ছোট অংশ দিয়েই নিষ্কাশিত হচ্ছে পুরো উচ্চ অববাহিকার জল।

এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের ধরন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সারাবছরের মোট বৃষ্টির প্রায় নব্বই শতাংশই ঘটছে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের কয়েকটি মাসের মধ্যে। এই মৌসুমী বৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা পরপর কয়েকটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আসতে থাকে। এই ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত দিন দুয়েক, আবার কখনও কখনও চার পাঁচদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এক বা দু'দিনের বৃষ্টিতে বন্যা হবার মত জল সঞ্চিত না হলেও, তিন-চার দিনের একটানা বৃষ্টি মাঝারি ধরনের বন্যা ঘটাতে পারে। আর যদি বৃষ্টির পরিমাণ বেশি এবং চার-পাঁচ দিন একটানা ঘটে তবে মারাত্মক রকমের বন্যা হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে বয়ে চলা দামোদরের পতিপথ অধিকাংশ মৌসুমী ঘূর্ণিঝড়ের সমান্তরাল, কিন্তু ঠিক বিপরীতে। এটাই সমস্যার অন্যতম প্রধান উৎসব। ঘূর্ণিঝড়গুলো এসে প্রথমেই বৃষ্টি ঘটাচ্ছে নিম্ন দামোদর অববাহিকায় যেখানে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে উঠছে। কিন্তু জমির ঢাল কম বলে এই জল চট করে সরছে না, নদীখাতেই বয়ে যাচ্ছে। নিম্ন অববাহিকায় বৃষ্টি ঘটানোর পর ঘূর্ণিঝড়গুলো উত্তর পশ্চিমে সরে গিয়ে বৃহত্তর উচ্চ অববাহিকায় বৃষ্টি ঘটাচ্ছে। এই অংশের ঢাল অনেক বেশি, সেজন্যে বিশাল এক অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির জল দামোদরের উপনদীগুলোর মাধ্যমে নীচের অংশে নেমে আসছে। এর ফলে নিম্ন অংশের অতিরিক্ত জল সরার আগেই উচ্চ অংশের জল এসে পড়ছে, সুতরাং বন্যার তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণে।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে দামোদরের বন্যা শুধু অবশ্যম্ভাবীই নয়, অপরিহার্যও, তাঁরা বলেন দামোদরের বন্যার জল ভাগীরথী হুগলী নদীর পলি স্বাভাবিকভাবে সরায়, এ কারণে এই বন্যা বিশেষ উপকারী। তাঁরা দামোদর উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রকল্পের বিষয়েই সন্দেহবাচক মতামত পোষণ করেন: তাঁদের মতে কোলকাতা বন্দরের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হল দামোদর প্রভৃতি পশ্চিমের মালভূমি থেকে নেমে-আসা নদনদীর ওপরের বাঁধগুলো।

নিম্ন দামোদর অববাহিকার বন্যার আর একটি দিক হল এই যে, উচ্চ অংশে ছাড়াও শুধু নিম্ন অংশেই যদি ঘূর্ণিঝড়ের ফলে প্রবল বৃষ্টি হয়, তাহলেও বন্যা ঘটতে পারে। কখনো কখনো ঘূর্ণিঝড়গুলো আসে খুব দ্রুত, একের পর এক। সেক্ষেত্রে দামোদর ও তার শাখানদীগুলোয় প্রতি সেকেন্ডে ৫০,০০০ ঘনফুটের বেশি জল বেরোনোর অবস্থা হলেই বন্যা সৃষ্টি হয়। এরকম বৃষ্টি উচ্চ অববাহিকাতেও হতে থাকলে বাঁধগুলো বিপন্ন হয়ে পড়ে। এদেরকে বাঁচাতে তখন নিম্ন অংশে বন্যার প্রাবল্য না কমা সত্ত্বেও জলাধারগুলো থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে নিম্ন দামোদর অববাহিকার বন্যা হয়ে ওঠে এক অর্থে মানুষের সৃষ্টি।

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প

আবার একথাও সত্যি যে আগের মত ঘন ঘন এবং প্রবল বন্যা দামোদরে তেমন আর দেখা যায় না। দামোদর এখন আর তেমন বিধ্বংসী রূপ নিয়ে দেখা দেয় না, একসময়ের বাঁধনহারা এই নদ আজ অনেকটাই শান্ত। সমস্ত অববাহিকায় এখন কল্যাণ ও উন্নতির স্মারকচিহ্ন রূপে দামোদরের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে 'দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন' (সংক্ষেপে ডি ভি সি)-এর সার্থক রূপায়ণের ফলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সেই সময়ে ১৯৪৩ সালে, কোলকাতা ছিল মিত্র শক্তির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান ঘাঁটি। সে বছর খেয়ালি মৌসুমী বাতাসের একটানা বর্ষণে দামোদরের জল ফুলে-ফেঁপে উঠে নদীর পাড়ে ভাঙন ধরালো। প্রবল বেগে জলের স্রোত ছুটে গিয়ে ভেঙে দিল জি টি রোড, গলিয়ে দিল পূর্ব রেলওয়ের লাইনের তলার উঁচু মাটির পাড়। ক্ষয়ক্ষতি যা হবার তা তো হলই, কিন্তু গোটা পৃথিবীর থেকে কোলকাতা শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল বেশ কয়েকদিনের জন্যে। স্বভাবতঃই এই নিয়ে সোরগোল উঠলো—এই সর্বনাশা

দামোদরের নিম্নপ্রবাহ

দামোদরকে যে কোনো উপায়ে বাঁধতেই হবে। গঠিত হল দশ সদস্যবিশিষ্ট এক টেকনিক্যাল কমিটি। নানান আলাপ আলোচনার পর কমিটির সদস্যরা রায় দিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'টেনিসি ভ্যালি অথরিটি'-র অনুসরণে দামোদর উপত্যকার জন্যেও একটি বহুমুখী প্রকল্প গড়ে তুলতে হবে। সেইমত তৎকালীন সরকারের ভাইসরয়, লর্ড ওয়াভেল ডেকে আনলেন টেনিসি ভ্যালির অন্যতম প্রধান রূপকার, ইঞ্জিনিয়ার ডবলিউ এল ভূরডুইন সাহেবকে। ১৯৪৬ সালে তিনি দাখিল করলেন 'দামোদর উপত্যকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কার্যপ্রস্তাব'। এরপর বাকিটুকু আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। ১৯৪৮ সালের সাতই জুলাই সংসদের এক আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি হল 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন'। বলা হল, এর দায়িত্বভার সমানভাবে বইবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকার।

দামোদরকে বাঁধার প্রস্তাব কিন্তু এই প্রথম ওঠে নি। ১৭৩০ সালের পর থেকেই নানান উপায়ে দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। ১৮৬৪ সালে লেফটেনান্ট গার্নট এবং ১৮৬৬ সালে লেফটেনান্ট হয়ওয়ার্ড চেষ্টা করেছিলেন দামোদরের ওপরে একটি জলাধার নির্মাণের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের। ১৯০২ সালে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অন স্পেশাল ডিউটি মিঃ হর্ন সুপারিশ করেন দামোদরের সঙ্গে মিলনের ঠিক আগে বরাকর নদীর ওপরে একটা জলাধার নির্মাণের। হয়তো বা এটিই ছিল পরবর্তীকালের মাইথন জলাধারের পূর্বাভাস। ১৯১৩ সালের বন্যার পরে মিঃ অ্যাডাম উইলিয়াম প্রস্তাব করেন এই সঙ্গে বরাকরের উচ্চগতিতে আরও একটি জলাধার নির্মাণের (সম্ভবত বর্তমানের তিলাইয়া বাঁধের কাছাকাছি কোথাও) ১৯১৮-১৯ সালে মিঃ গ্লাস সুপারিশ করেন দামোদরের ওপরে পারজোরি, বরাকরের ওপরে পালকিয়া, এবং উশ্রির ওপরে চিত্র—এই তিনটে জায়গায় বাঁধ দেবার।

ভূরডুইনের মূল পরিকল্পনায় আটটা জলাধার ও বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব ছিল—বরাকরের ওপরে তিলাইয়া, দেওলহরি (বলপাহাড়ি) ও মাইথনে, দামোদরের ওপরে আইয়ার, সোনোলাপুর (পাঞ্চেতের কাছে) ও বেরমোতে, বোকারো নদীর ওপরে বোকারোতে, এবং কোনার নদীর ওপরে কোনারে। এই সব কটা জলাধারে ধরে রাখা সম্ভব হত এক বিপুল পরিমাণ বন্যার জল—যা দিয়ে আটকানো যেত নিম্ন অববাহিকার বন্যা, সৃষ্টি করা যেত প্রচুর বিদ্যুৎ এবং খালগুলোর মাধ্যমে শুখা মরশুমে চাষের ক্ষেতে পাঠানো যেত প্রচুর জল।

ভাগ্যের পরিহাস এমনই, যে শুরু থেকেই ডি ভি সির তিন অংশীদার সরকারে টানাপোড়েনের এক খেলা শুরু হল মূলধনের যোগান দেওয়া নিয়ে। উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের অভাবে গড়ে তোলা হল মাত্র চারটে বাঁধ ও জলাধার—তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত (সোনোলাপুরের বদলে)এবং কোনার। পরবর্তীকালে বিহার সরকার নিজেই নির্মাণ করলেন আর একটি জলাধার—তেনুঘাট, প্রধানত বোকারো ইস্পাত কেন্দ্রে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে। এই বাঁধ থেকে সেচ, জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন আবার কথা হচ্ছে বলপাহাড়িতে আরও একটি জলাধার নির্মাণের। এসব বাঁধ ও জলাধার তৈরির ফলে নিম্ন অববাহিকার বন্যা পুরোপুরি বন্ধ না হলেও, তাঁর তীব্রতা ও সংখ্যা যে বেশ কিছুটা কমেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ডি ভি সি-র সেচ খালগুলোর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার প্রায় ৬ লক্ষ হেকটর জমিতে সেচের জল পৌঁছে দিচ্ছে এরা। এরাই সম্ভব করেছে নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে দুই বা ততোধিকবার ফসল ফলানো, ফুটিয়ে তুলেছে চাষীর মুখে হাসি।

আজ পর্যন্ত ডি ভি সি খরচ করেছে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে মোট প্রায় ৮২৮ কোটি টাকা, সেচের ব্যবস্থায় ৬৭ কোটি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে ২১ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অংশই বেশি। আজ এই ডি ভি সি হয়ে উঠেছে কর্মসংস্থানের এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। এখানে কর্মরত অফিসার ও নানান ধরনের কর্মচারিদের মোট সংখ্যা প্রায় সতেরো হাজার। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডি ভি সি তার উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। বিদুৎশক্তি উৎপাদন করছে বটে। কিন্তু তার অধিকাংশই তাপবিদ্যুৎশক্তি। অথচ ডি ভি সি-র মূল অ্যাক্টে একথা পরিষ্কার বলা আছে যে এর অঞ্চলের মধ্যে কোনোরকম তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন চলবে না। অথচ ডি ভি সি স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই বিহার সরকার স্থাপন করেন পত্রাতু, চন্দ্রপুরা ও দুর্গাপুরে ডি ভি সি নিজেই গড়ে তোলে দুটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, দুর্গাপুর ও ব্যাণ্ডেলে আরও দুটি আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে। জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে কেবলমাত্র তিলাইয়া, পাঞ্চেত ও মাইথনে। এদের মধ্যে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যয় সর্বনিম্ন পাঞ্চেতে—মাত্র ১০·৪৬ পয়সা, তিলাইয়ায় সর্বোচ্চ—৩১·৭২ পয়সা। তা সত্ত্বেও বলাই বাহুল্য, তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যয়ের চেয়ে এ অনেক কম। অথচ সেই গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে ডি ভি সি জলবিদ্যুতের তুলনায় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে বেশি মনোযোগী। গত বছরে ডি ভি সি উৎপন্ন করেছে ৬০৫৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা তাপবিদ্যুৎ। অথচ মাত্র ৪০৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা জলবিদ্যুৎ। ডি ভি সি-র বিদ্যুতের প্রধান ক্রেতা বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, বোকারো ইস্পাত কেন্দ্র, টাটা লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, সি ই এস সি, দিশেরগড় বিদ্যুৎ কোম্পানি, ও রেলওয়েজ।

বর্তমানে ডি ভি সি-র অন্যতম প্রধান সমস্যা উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে ব্যাপক অরণ্যনিধনের ফলে যে বিপুল ভূমিক্ষয় শুরু হয়েছে তার মোকাবিলা করা। ভূমিক্ষয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে জলাধারগুলোতে—এদের আয়ু কমে আসছে দ্রুত। ডি ভি সি এই ভূমিক্ষয় রোধে সঠিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণে সজাগ হয়ে উঠেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দামোদর উপত্যকা হয়ে উঠবে ভারতের অন্যতম উন্নত অঞ্চল।

দামোদরের খালগুলি এনেছে কৃষিক্ষেত্রে প্রাণের সাড়া